শ্লীল অশ্লীল বনাম রাজনীতি

সোমেশ্বর ভৌমিক

ফিল্ম সেন্সরশিপ নিয়ে স্বাধীন ভারতে বিপ্লব নাটক হয়েছে। সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন-এর সভাপতির পদ থেকে বিজয় আনন্দের পদত্যাগ (১৩ জুলাই, ২০০২) এই তালিকায় নবতম সংযোজন। কিন্তু ফিল্ম সেন্সরশিপ নিয়ে ন াটকের বাইরে আরও অনেক কিছু হয় এদেশে। সবচেয়ে বেশি হয় রাজনীতি। অনেকটাই তার লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিছু ঘটনা আসে খবরের কাগজের ভেতরের পাতায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

বিজয় আনন্দের পদত্যাগের ঠিক ৩৭ দিন আগে, ২০০২ সালের ৬ই জুন তথ্যচিত্র-নির্মাতা আনন্দ পটবর্ধনের ছবি 'ওয় ার অ্যান্ড পিস'-এর মূল্যায়ন করেন অনুমোদন পর্ষদের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে তৈরি পরীক্ষণ পর্ষদ (এগজামিনিং কমিটি)। পটবর্ধন তাঁর ছবিতে ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সম্পর্ক, পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে দু-দেশের রেষারেষি আর কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে তাদের যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা, এসব কিছুই বিশ্লেষণ করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। ছবিটি দেখার পর পরীক্ষণ পর্ষদের মত হল ঃ

ক) পাকিস্তানীরা ভারতের জাতীয় পতাকা পোড়াচ্ছে, এই দৃশ্য বাদ দিতে হবে। (অবশ্যই ভারতীয়রা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পোড়াচ্ছে, এমন দৃশ্য বিষয়ে কোনো আপত্তি ওঠে নি।)

খ) বৌদ্ধ দলিত নেতা যেখানে বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে পারমাণবিক পরীক্ষার সমালোচনা করেছেন, সেই অংশ বাদ দিতে হবে।

গ) বাদ দিতে হবে দলিতদের একটা গান, যে-গানে বলা হয়েছে গান্ধীজীর হত্যাকারী একজন ব্রাহ্মণ।

ঘ) বাদ দিতে হবে একটি সাক্ষাৎকারের অংশ, যেখানে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী বলছেন, চীন হল আমাদের পরবর্তী শত্রু।

ঙ) ছবি থেকে বাদ দিতে হবে তেহেল্‌কা-সংক্রান্ত সমস্ত দৃশ্য আর কথাবার্তা। (বফর্স কামান কেনা নিয়ে দুর্নীতির যেসব উল্লেখ ছবিতে আছে, সেবিষয়ে কোনোই আপত্তি তোলা হল না।)

চ) সাধারণভাবে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা, এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যও ছবি থেকে বাদ দিতে হবে।

বিজয় আনন্দের পদত্যাগ-নাটকের পরোনীল-অশ্লীল বা যৌনতার প্রশ্নে ভারতীয় ছবির 'সাবালক' হয়ে ওঠা নিয়ে যে পরিমাণ জলঘোলা হয়েছে, তার একটা সামান্য ভগ্নাংশও আনন্দ পটবর্ধনের ছবির এই মূল্যায়নের খবরকে ঘিরে হয় নি। অথচ অ ামাদের দেশে চলচ্চিত্র-অনুমোদন বা ফিল্ম সেন্সরশিপের যে একটা রাজনৈতিক ভূমিকাও আছে, এই উদাহরণ তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। এই প্রবন্ধে দেখাতে চেয়েছি, ইতিহাসের এক গুত্বপূর্ণ পর্যায়ে কীভাবে তৈরি হয়েছিল ওই রাজনৈতিক ভূমিক ার পরিপ্রেক্ষিত।

ভারতে ফিল্ম সেন্সরশিপ চালু হয়েছিল ১৯২০ সালের ১লা জুলাই। বৃটিশ আমলে, অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, ফিল্ম সেন্সরশিপের ওপর ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থা বা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রন। বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন (১৯৩৫ সাল পর্যন্ত) আর লাহোর শহরের আঞ্চলিক সেন্সর পর্ষদগুলিতে সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন পুলিশ কমিশনাররা। সদস্যরা সকলেই ছিলেন সরকার - মনোনীত। এই আঞ্চলিক পর্ষদগুলির সবকটিই ছিল সমপর্যায়ের। পর্ষদে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয় া হত, সে ব্যাপারে কোনো কথা বলার এত্তিয়ার ছিল শুধু প্রশাসনিক মহলের। এ-নিয়ে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার কে ানো ব্যবস্থাই তখন রাখা হয়নি। বিধিনিষেধের তালিকায় অশ্লীলতা, যৌনতা আর নৈতিক আচরণ-সংক্রান্ত বিষয়ের পাশাপ াশি রাখা হয়েছিল অসামাজিক ব্যবহার, হিংসাত্মক ঘটনা, শ্রেণী বা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বজনিত বিভিন্ন সমস্যাকে। এই তালিক ায় চোখ বোলালেই বোঝা যাবে যে, বৃটিশ সরকার সিনেমার অভিঘাত বিষয়ে বিশেষভাবে সন্দিহান ছিলেন। আসলে এই সন্দেহ তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল। আধুনিক গবেষণায় এটা প্রমাণ হয়েছে যে, ফিল্ম সেন্সরব্যবস্থ ার মধ্যে দর্শক-নিরাপত্তা আর নৈতিকতার শাক দিয়ে বৃটিশ সরকার রাজনীতির মাছ ঢাকতে চাইছিলেন। (১) তাঁদের সেই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণগুলো এরকম ঃ

১) সোভিয়েত সিনেমার হাত ধরে কোনোভাবেই যেন বিপ্লবচিন্তা এদেশের মানুষের কাছে পৌঁছতে না পারে।
২) আমেরিকান সিনেমার মাধ্যমে মুক্তচিন্তা আর স্বাধীনতার বাণীগুলো যেন এদেশের মানুষকে প্রভাবিত করতে না পারে।
৩) ভারতীয় ছবিতে যেন জাতীয়তাবাদী প্রকল্পগুলো দানা বাঁধতে না পারে।

স্বাধীনতার পরে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার এই ছকটা নিশ্চয়ই আর প্রাসঙ্গিক ছিল না। তবু সবাইকে অবাক করে স্বাধীন ভারতের সরকার ফিল্ম সেন্সরব্যবস্থাটিকে চালু রাখলেন। তবে সমপর্যায়ের প্রাদেশিক সেন্সর পর্ষদগুলি অবলুপ্তি ঘটিয়ে তৈরি করা হল কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, আর দেশের বিভিন্ন গুত্বপূর্ণ শহরে চালু হল আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ড। কেন্দ্রীয় বোর্ডে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল সরকার-মনোনীত একজন মানী ব্যক্তিকে, প্রাদেশিক বোর্ডগুলির দায়িত্বে এলেন প্রশাসনেরই কোনো আধিকারিক। কিন্তু মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকল বৃটিশ শাসনের কালে প্রবর্তিত সেন্সর বিধিনিষেধের তালিকাটি। প্রশ্ন হল, কী এমন ঘটলো, যাতে বৃটিশ আমলে চালু হওয়া ফিল্ম সেন্সরব্যবস্থাকে এই নতুন কলেবরে বহাল করতে হল?

১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারতের জন্যে যে-সংবিধান প্রণীত হয়েছিল, তার ১৯(১)(ক) ধারায় বলা হল ঃ 'দেশের প্রতিটি নাগরিকের থাকবে বাক্-স্বাধীনতা আর অবাধ অভিব্যক্তির অধিকার' (right to freedom of speech and expression)। আর ১৯(২) ধারায় বলা হল ঃ 'নাগরিকদের এই অধিকার সত্বেও অপরের বিষয় সম্মানহানিকর কোনো বক্তব্য, অপবাদ, কুৎসা, আদালত অবমাননা, শালীনতা বা নৈতিকতার পরিপন্থী কোনো বিষয়, অথবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে বা রাষ্ট্রশক্তিকে উৎখাত করতে পারে এরকম কোনো বিষয়ে প্রচলিত আইন প্রয়োগ করার ব্যাপারে, বা নতুন করে এ-বিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা থাকবে'। তবে কখনো এইসব নিয়ন্ত্রণের প্রায়োগিক পরিধি নির্দিষ্ট নয়। প্রশ্ন তোলা হল প্রয়োগের ধরন নিয়েও। ১৯৫০ সালে অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে (২) নাগরিকদের তরফে আদালতে আবেদন করে বলা হল যে মৌলিক অধিকারের ওপর আইন মোতাবেক নিয়ন্ত্রণ আরোপের অধিকার সংবিধান রাষ্ট্রকে দিলেও সেই আইনের পরিধিতে প্রাক্-নিষেধাজ্ঞার কোনো জায়গা নেই। আদালতের রায়েও এই যুক্তি গ্রাহ্য হল।

এই ঘটনায় সাড়া পড়ে গেল নবীন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক মহলে। বৃটিশ আমলে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, বই এবং সংবাদপত্রের ওপর ব্যাপকহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল, নানা ধরনের প্রাদেশিক আইনের সূত্রে। রাষ্ট্রের ভয় হল, সেইসব আইনকে এবার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হতে পারে। আদালতের রায়ে সেইসব আইন বাতিল হলে তখনই যে রাষ্ট্রের খুব অসুবিধে হত, তা নয়। ভয়টা ছিল অন্য জায়গায়। আদালত যদি নীতিগতভাবে প্রাক্-নিষেধাজ্ঞাকে মৌলিক অধিকারের ওপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণের আওতা থেকে বার করে আনে, রাষ্ট্রের পক্ষে সেটা হবে এক ধরনের পরাজয়। অন্তত স্বাধীন ভারতের প্রশাসন এমনটাই ভেবেছিলেন। প্রশাসনের যে আদল আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি, সেই বৃটিশ ব্যবস্থায় কিন্তু প্রাক্-নিষেধাজ্ঞা কখনোই প্রশাসনিক হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। বৃটেনে মতপ্রকাশের কোনো মাধ্যমের ওপরেই সরকারের তরফে প্রাক্-নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায় না। এমনকি ফিল্মের ওপরেও নয়। বৃটিশ বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সর্স্ কাগজে-কলমে নেহাৎই বেসরকারি সংস্থা। আসলে যেগুলোকে আমরা জানি মৌলিক অধিকার বলে বৃটেনে সেগুলোকেই দেখা হয় নাগরিক অধিকার বা স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সুবাদে এইসব অধিকারের ক্ষেত্র সেখানে শুধু ব্যাপকই নয়, সেসবের প্রভাবও অবিসংবাদী। এব্যাপারে কোনোরকম নিষেধাজ্ঞা সেদেশে বরদাস্ত করা হয় না। এতখানি নাগরিকতা বা স্বাভাবিকতা ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে হজম করা ছিল মুস্কিল। (৩)

তাই ১৯৫১ সালের জুন মাসেই প্রণীত হল ভারতীয় সংবিধানের প্রথম সংশোধনী। এই সংশোধনীতে বলা হল, বিশেষ ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের ওপর 'যুক্তিসঙ্গত প্রতিবন্ধক'(reasonable restrictions)আরোপ করার পক্ষে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের অধিকার থাকবে রাষ্ট্রের। এবং 'যুক্তিসঙ্গত প্রতিবন্ধক'- এর আওতায় অবশ্যই থাকতে পারে 'প্রাক্-নিষেধাজ্ঞা' (pre-censorship)। তবে এইসব প্রতিবন্ধক যুক্তিসঙ্গত কিনা এবং আইনি ব্যবস্থা মেনে সেসবের প্রয়োগ হচ্ছে কিনা, তা বিচারের দায়িত্ব থাকবে আদালতের ওপর। (৪)

এই সংশোধনী ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায়, বিশেষ করে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহলে, এনে দিল স্বস্তির হাওয়া। ধ্রুপদী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের নিরিখে প্রাক্-নিষেধাজ্ঞা যতই আপত্তিকর হোক্, জায়মান গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে তাকে মনে করা হল

একটি অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা। এই প্রাক্-নিষেধাজ্ঞা কোথায় কীভাবে, কতটা প্রয়োগ করা হবে, সেসব ব্যবহারিক প্রশ্ন অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু তার চেয়েও জরি ছিল এর নীতিগত প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটি। সেই প্রয়োজনীয়তার কথাই স্বীকার করে নেওয়া হল এই সংশোধনীতে। (৫)

ভারতীয় সংবিধানের এই প্রথম সংশোধনী তাই এক অর্থে ভারতে সভ্য সমাজ তৈরির প্রক্রিয়ায় প্রথম কুঠারাঘাত; অন্যদিকে এটি এদেশে রাজনৈতিক সমাজ গঠনের পথে প্রথম গুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যেন বলেই দেওয়া হল, এরপর থেকে স্বাধীন ভারতের নাগরিক জীবনে রাজনৈতিক স্বার্থে বলিপ্রদত্ত হবে ব্যক্তিস্বার্থ - বিশেষ করে বাক্-স্বাধীনতা বা অবাধ অভিব্যক্তির প্রসঙ্গে। সদ্য স্বাধীন দেশটিতে এই বিষয়টি যেধরনের রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, তার চেহারাটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হল এই সংশোধনীতে। এর ফলে ১৯(২) ধারার বয়ানটা দাঁড়াল এরকম ঃ ' সংবিধানের ১৯(২)(ক) ধারায় যাই বলা থাকুক, প্রচলিত কোনো আইন প্রয়োগ করেঅথবা রাষ্ট্র-কর্তৃক নতুন আইন-প্রণয়ন করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, নাগরিক শৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে অথবা আদালত অবমাননা, অথবা অপরাধে প্ররোচনা দেওয়া ঠেকাতে বাক্-স্বাধীনতা বা অবাধ অভিব্যক্তির ওপর কিছু যুক্তিসঙ্গত প্রতিবন্ধক আরোপ করাই যাবে'। (৬)

সংবিধানের এই প্রথম সংশোধনী বিষয়ে নাগরিক ক্ষেত্রে যে খুব জোরালো প্রতিবাদ ওঠে নি তার একটা বড় কারণ, ভারতীয় গণতন্ত্রের তৎকালীন শৈশবাবস্থা। আর-একটা কারণ, সেসময়কার রাজনৈতিক আবহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা আর দেশভাগ পেরিয়ে ভারত তখন স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব, দাঙ্গার ভয়াবহ অমানবিকতা আর দেশভাগের রাজনৈতিক ডামাডোলে দেশের তখন বিপর্যস্ত অবস্থা। বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে উঠেছে প্রবল আলোড়ন। নিছক অর্থনৈতিক কারণেই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে। পারিবারিক শৃঙ্খলা, সামাজিক সম্পর্ক সবকিছু ভেঙে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সম্ভাবনা নিয়ে এল নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই দাঙ্গার আগুন জ্বলেছে দেশভাগের পরেও বহুদিন ধরে। ফলে পরাধীন ভারতের শেষ লগ্নে দেশ থেকে হারিয়ে গেছে নাগরিক শৃঙ্খলা। আর, স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করার বদলে আমরা জড়িয়ে পড়েছি সদ্য গঠিত এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে শত্রুতায়। আমাদের নামতে হয়েছে কূটনৈতিক প্যাঁচ-পয়জারের জটিল আবর্তে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই শু হয়ে গেছে নতুন সমাজ গঠনের কাজ। একই সঙ্গে সেই সমাজকে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করারও দায়। ফলে এখানেও এক জটিল টানাপোড়েন। এই পরিস্থিতিতে, সামাজিক উন্নয়নের দোহাই দিয়ে ধ্রুপদী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পায়ে রাজনৈতিক স্বার্থের বেড়ি পরানোর কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল।

আদালতের গন্ডিতে অবশ্য এই তথাকথিত 'যুক্তিসঙ্গত প্রতিবন্ধক' নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আরো কিছুদিন। বাক্-স্বাধীনতা আর অবাধ অভিব্যক্তির ওপর 'অযৌক্তিক প্রতিবন্ধক' আরোপ করেছে, এই যুক্তিতে বেশ কিছু আইনের বৈধতাও খারিজ হয়েছে আদালতে। আইনে প্রয়োগবিধির ব্যবস্থাটাই ত্রুটিপূর্ণ, এইকারণে ১৯৫৬ সালে খারিজ হল ১৮৭৬ সালে প্রণীত নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের একটি জরি ধারা। কিন্তু মূল যে-প্রসঙ্গটি নতুন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, সেই প্রাক্-নিষেধাজ্ঞা অবশেষে আদালতের চোখেও বৈধতা পেল ১৯৬০ সালে। সুপ্রীম কোর্টের একটি রায়ে বলা হল ঃ প্রতিবন্ধকের তালিকায় অবশ্যই থাকতে পারে প্রাক্-নিষেধাজ্ঞা; শুধু নীতিগত আর প্রয়োগগত ক্ষেত্রে সেটিকে যুক্তিসঙ্গত হতে হবে (reasonable, both substantively and procedurally) । (৭) মৌলিক অধিকার, বিশেষ করে বাক্ স্বাধীনতা আর অবাধ অভিব্যক্তি বিষয়ে স্বাধীন ভারতের বুকে এভাবেই জন্ম নিল এক নতুন পরিকল্প (paradigm) । এই পরিকল্প নাগরিক বা স্বাভাবিক আইনগত অধিকারের ধ্রুপদী পরিকল্প থেকে মূলেস্থূলেই আলাদা।

এই নতুন পরিকল্পের আঁচ সচরাচর আমাদের নাগরিকজীবনে পড়ে না। তাই 'মুক্ত' গণতন্ত্রের মহিমায় এখনো আমরা বিহ্বল। কিন্তু সিনেমা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা প্রতিমূহূর্তে উপলব্ধি করেন এই পরিকল্পের প্রভাব। দুভাবে এটা হয়। প্রথমত, বিনোদনমূলক সিনেমায় যেধরনের দৃশ্যের প্রবাহ আমরা দেখি, তার সঙ্গে স্বাভাবিক শালীনতা বা ব্যবধান এত দুস্তর যে আমাদের আশ্চর্য হতে হয়। অচিরেই অবশ্য সেই বিস্ময় পৌঁছে যায় একটি অমোঘ উপলব্ধি আমাদের বলে, কাগজে-কলমে আইনের যে-ভাষা, তার থেকে আলাদা তার ব্যাখ্যার জগৎ, এবং আরো আলাদা তার প্রয়োগের ক্ষেত্র। তাই অনেকসময় প্রতিবন্ধক (বা তার ব্যাখ্যা) এমনকি হয়ে দাঁড়ায় ছাড়পত্রও। সংবিধানের ১৯(২) ধারা অনুযায়ী, বিদেশী

রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিঘ্নিত হতে পারে, এমন কোনো অভিব্যক্তির ওপর যুক্তিসঙ্গত প্রতিবন্ধক, এমনকি প্রাক্-নিষেধাজ্ঞা, আরোপ করার জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার রাষ্ট্রের চোখে অবাঞ্ছিত। কিন্তু তার মানে কি এই যে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক বাড়তে পারে, এমন অভিব্যক্তি রাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত? অন্যান্য মাধ্যমের কথা জোর দিয়ে বলতে পারবো না, কিন্তু গত কয়েক বছরে তথাকথিত মূলধারার ভারতীয় সিনেমায় দেশপ্রেমের অজুহাতে পাকিস্তানের বিদ্ধে বিষোদ্গারের বন্যা এরকম একটি ব্যাখ্যার দিকেই ইঙ্গিত করে। (৮) এই কারণে অনন্ত পটবর্ধনের ছবির উদাহরণ টেনেই বলা যায় যে, প্রাক্-নিষেধাজ্ঞার সম্ভাবনা মতপ্রকাশের বা বিনিময়ের অন্যান্য মাধ্যমকে নিরন্তর প্রভাবিত না করলেও, চলচ্চিত্রমাধ্যমকে সদাই সন্ত্রস্ত রাখে।

১৯১৭ সালের ভারতীয় চলচ্চিত্র আইনকে ছুটি দিয়ে ১৯৫২ সালে তৈরি হয়েছে নতুন চলচ্চিত্র আইন। এই আইনের ৫খ ধারা অনুসারে ঃ

(ক) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যদি মনে হয় যে একটি ছবি, বা তার অংশবিশেষ, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সামাজিক শৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিক আচরণ বিঘ্নিত করবে, অথবা মানহানি, আদালত অবমাননা বা অপরাধমূলক কাজকর্মে প্ররোচনা দেবে, তাহলে সেই ছবিকে সাধারণ্যে প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে না।

(খ) পূর্বোক্ত ধারামতে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনমতো নির্দেশ জারি করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সাধারণ্যে প্রদর্শনযোগ্য ছবি সম্পর্কে নীতি প্রণয়ন করার ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন।

এই আইনের জোরে সাধারণ্যে প্রদর্শনযোগ্য চলচ্চিত্র সম্পর্কে যেসব নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, তার একটি 'অপরিহার্য' অংশ হল আপত্তিজনক বিষয় বা দৃশ্যের তালিকা। ভারতে ছবি বিষয়ে আপত্তি ওঠে বা প্রাক্-নিষেধাজ্ঞা জারি হয় এই তালিকা মেনে। কিন্তু এই তালিকাটিকে 'বেআইনি' বলেছিলেন একজন বিচারপতি। অবসরপ্রাপ্ত এই বিচারপতি জি ডি খোসলা ১৯৬৯ সালে একটি সরকারি অনুসন্ধান পর্ষদের সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেই অনুসন্ধান পর্ষদকে সাধারণভাবে 'খোসলা কমিটি' বলা হয়, যদিও তার পোষাকি নাম ছিল 'ফিল্ম সেন্সরশিপ বিষয়ে অনুসন্ধান পর্ষদ'। তাঁর প্রতিবেদনে বিচারপতি খোসলা লিখেছিলেন ঃ 'আমাদের অনুসন্ধানে একথা পরিষ্কার যে, চলচ্চিত্র-অনুমোদনের ব্যাপারে যেসব বিধিনিয়ম এখন চালু আছে, সেগুলোর পেছনে কোনো আইনি অনুমোদন তো নেই-ই, সেগুলোকে যুক্তিসঙ্গত বা সুবিবেচনাপ্রসূতও বলা যাবে না'। (৯) এতখানি কড়া কথা বলার পরেও অবশ্য বিচারপতি খোসলা সংবিধানের ১৯(২) ধারার 'যুক্তিসঙ্গত প্রতিবন্ধক' বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেন নি। এমনকি, একথাও ওনার মনে হয়েছিল, কোনো ছবিরই এসব 'যুক্তিসঙ্গত প্রতিবন্ধক' - এর গন্ডি পেরোনো উচিৎ নয়। কোনো ছবির অংশবিশেষ যদি 'যুক্তিসঙ্গত প্রতিবন্ধক'- এর আওতায় পড়ে যায়, তাহলে ছবি থেকে সেই অংশটি বাদ দেওয়ারও সুপারিশ করেছিলেন উনি।

এব্যাপারে বরং আর-একটু প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছিলেন খাব্জা আহ্মেদ আববাস, যিনি 'ফিল্ম সেন্সরশিপ বিষয়ে অনুসন্ধান পর্ষদ'-এর সদস্য ছিলেন। প্রাক্-নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি ভারতীয় নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতা বা অবাধ অভিব্যক্তির মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী, এই আর্জি জানিয়ে আববাস দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ১৯৭১ সালে। কিন্তু, তৎকালীন মুখ্য বিচারপতি হিদায়েতুল্লা তাঁর রায়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ঃ 'ভারতে ফিল্ম সেন্সরশিপ (যার মধ্যে প্রাক্-নিষেধাজ্ঞাও পড়ে) আইনের চোখে পুরোপুরি যুক্তিগ্রাহ্য। অবশ্য অন্যান্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এই একই মাপকাঠি আমরা ব্যবহার করতে বলবো না, কারণ মাধ্যমভেদে বাক্-স্বাধীনতা বা অবাধ অভিব্যক্তি সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের বৈষয়িক তাৎপর্য এবং গুত্ব বদলাতেই পারে'। এই রায়েরই একেবারে শেষ পর্যায়ে একথাও বলা হল যে, 'চলচ্চিত্র-নির্মাণ এবং প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রাক্-নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যবস্থাটি সমাজের স্বার্থেই জরী'।

মৌলিক নাগরিক অধিকারের প্রয়োজনে বই, সংবাদপত্র, এমনকি নাটকের ক্ষেত্রেও যে-ছাড়টুকু দিতে রাজি ছিল ভারতীয় রাষ্ট্র, (১০) সিনেমার ক্ষেত্রে সেই ছাড় দিতে কেন তার প্রবল অনীহা, সেবিষয়ে খুব যে গবেষণা হয়েছে তা নয়। এই গবেষণাটা জরী। এখানে অল্পকথায় এব্যাপারে কিছু বলা যেতে পারে।

স্বাধীন ভারতের সেই আদি পর্বে জাতি, রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ আর আধুনিকতার বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বয়ে তৈরি হচ্ছিল একটা জটিল নক্শা। এই তাত্ত্বিক ধারণাগুলোর প্রতিটিই আদতে পাচাত্যের অবদান -- আরো ঠিক করে বললে, পরিণত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর বুর্জোয়া সভ্যতার ফসল। যে ভারতীয় সমাজের শরীরে এগুলোকে প্রতিস্থাপিত করার চেষ্টা

হচ্ছিল, সেখানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর বুর্জোয়া সভ্যতা দুয়েরই প্রভাব ছিল সীমিত। ফলে একধরনের আর্যপ্রয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল সেখানে। তবু স্বাধীন ভারতীয় সমাজের রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক উপাদান হিসেবে পরিকল্পনা-ভিত্তিক উন্নয়ন, আর মতাদর্শগত উপাদান হিসেবে সমতা আর সামাজিক ন্যায়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে নি। এই নক্শার সাংস্কৃতিক উপাদানটিকেই নিয়ে তৈরি হল সমস্যা। যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, ধর্মীয় অনুশাসন, সনাতন ভারতীয় আদর্শ --- এসবের টানাপোড়েন স্বাধীন ভারতের সংস্কৃতিকে প্রথম থেকেই দীর্ণ করেছে। হয়তো এমনটাই বলা সঙ্গত যে, এই সবকিছুর সংমিশ্রণে তৈরি হয়ে গেছে এক ধরনের ধূসর অথবা অনির্দিষ্ট চালচিত্র। সেই ধূসর চালচিত্রের গুত্বপূর্ণ প্রতীক হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতীয় সিনেমা। সমাজে তার অবস্থান নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। গড়ে ওঠে নি তার কোনো সমসত্ত্ব রূপ। সর্বাধিক দর্শক আকর্ষণের তাগিদে একধরনের সিনেমা হয়ে উঠেছে বিনোদনপ্রধান, এই সিনেমার বাণিজ্যীকরণ হয়েছে একশ্রেণীর লগ্নীকারীর প্রভাবে -- এর ফসল হিন্দিভাষা নির্ভর সর্বভারতীয় সিনেমা। আবার সমাজের সংবেদনশীল মানুষের দল সিনেমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন শিল্পের দায় - তৈরি হচ্ছে সিনেমার বাস্তববাদী প্রকল্প, তথাকথিত শিল্প-চলচিচত্রে। কোনো -কোনো মহলে সিনেমা আবার উন্নয়নের হাতিয়ার --- শিল্প নয়, পর্যবেক্ষণ আর প্রচারই সেখানে লক্ষ। তাঁদের উদ্দিষ্ট তথ্যচিত্র। আর- একদল মানুষও ছিলেন সমাজে --তাঁদের মতে সিনেমার প্রভাব সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। সর্বোপরি ছিল রাষ্ট্র -- তার দাবি, সদ্যস্বাধীন দেশের সুনাগরিক তৈরির অন্তত কিছুটা দায় নিক সিনেমা। সিনেমাকে ঘিরে এত বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন আর চাহিদাগুলো যে খুব সুশৃঙ্খল, সংগঠিতভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল, তা অবশ্য নয়। ইতস্তত লেখা প্রবন্ধ, বক্তৃতা, সংক্ষিপ্ত দলিল, ইস্তাহার বা টুকরো মন্তব্যই হয়তো ছিল এসবের বাহন। তবে এদের যোগফলে বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্যের একটা মোটামুটি আদল অবশ্যই পাওয়া যাচ্ছিল। আর সেই সূত্রেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তাদের আপেক্ষিক অবস্থান। অর্থাৎ, কোনো একটিমাত্র যুক্তি বা একমাত্রিক বক্তব্যের পরিবেশ নয়, স্বাধীন ভারতে সিনেমাকে ঘিরে তৈরি হল বেশ একটা বহুমাত্রিক আলোচনা আর চর্চার আবহ --- মিশেল ফুকোর ভাষায় একেই বলা যায় ডিসকোর্স। এই ডিসকোর্সে সাধারণভাবে রাষ্ট্রস্বরের তুলনায় নাগরিকস্বরটি ছিল প্রবল। এবং এরই প্রভাবে স্বাধীন ভারতে চলচিচত্রের চেহারাটা গেছে বদলে। ফিল্ম সেন্সরশিপ নিয়ে চাপান-উতোরও ছিল এই ডিসকোর্সের মধ্যে। তবে খুব উচ্চকিতভাবে নয়। এবং এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে রাষ্ট্রস্বরের বিপরীতে নাগরিকস্বরটি ছিল লক্ষণীয়ভাবে দুর্বল। ফলে সিনেমা বিষয়ে নানা মূল্যায়নের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটানোর নাম করে এদেশে সিনেমার চারদিকে তোলা হল বিধিনিষেধের প্রাচীর।

মজার কথা, এই প্রাচীর নিয়ে কোনো পক্ষই বিশেষ উচ্চবাচ্য করে নি। প্রত্যেকেই নিজের মতো করেএর উপযোগিতা স্বীকার করে নিয়েছে। (১১) বলা ভালো, প্রত্যেকেই ভেবেছে যে সিনেমা বিষয়ে তার মূল্যায়ন আর চাহিদার দাবি এর ফলে সংরক্ষিত হবে। আইনের গন্ডির বাইরে একধরনের নাগরিক বৈধতাও পেয়ে গেছে স্বাধীন ভারতে ফিল্ম সেন্সরশিপের ব্যবস্থা। আর এখন তো এমন সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বিনোদনমূলক সিনেমার কুদৃশ্যগুলো কাগজে-কলমের নানা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়ে যায় রাষ্ট্রেরই পরোক্ষ প্রশ্রয়ে। খুব বেশি বাড়াবাড়ি যখন হয়, তখন অবশ্য মাঝে-মাঝে নেমে আসে সেন্সর বোর্ডের খড়্গ। এর ফলে ফিল্ম সেন্সরশিপের 'প্রয়োজনীয়তা' আর প্রতিবন্ধকগুলির 'বৈধতা' বিষয়ে নাগরিকেরা নতুন করে আশ্বস্ত হয়।

স্বাধীন ভারতে ফিল্ম সেন্সরশিপ তাহলে এমন কিছু নয়, যেখানে নাগরিকদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্র চাপিয়ে দিচ্ছে কোনো দমননীতি। এবিষয়ে কিছু অন্যমত বা প্রতিবাদ ইতস্তত নিশ্চয়ই ছিল বা এখনো আছে। তবে এদেশের অধিকাংশ নাগরিক রাষ্ট্রের সঙ্গে এব্যাপারে মোটামুটি সহমতই পোষণ করেন। তাঁদের মতে, ফিল্মের ওপর অবশ্যই থাকা উচিৎ কিছু নিয়ন্ত্রণ, কারণ মাধ্যমটি আমাদের শ্রবণ ও দর্শনকে সুকৌশলে চালনা করে ছস্ক্লন্দ্মাত্তপ্তব্ধনস্ফগ্গ, আমাদের স্নায়ুকে আলোড়িত করে আর এভাবেই আমাদের বোধকেও করে প্রভাবিত। পৃথিবীর অনেক দেশেই যখন ফিল্ম সেন্সরশিপ আবর্তিত হচ্ছে শুধু অপ্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের কথা মাথায় রেখে, এখানে এখনো ব্যাপারটা সেরকম নয়। এখানে রাষ্ট্র-আরোপিত একটি সার্বিক দমননীতির আমরাও শরিক।

আমেরিকান সাংবাদিক রিশার্ড কাপুসিন্স্কি লিখেছিলেন, জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য একনায়কতন্ত্র প্রয়োগ করে সেন্সরশিপ, আর গণতন্ত্রে ব্যবহার করা হয় আরও সূক্ষ্ম কৌশল (In a dictatorship, censorship is used; in a

democracy, manipulation)। এইসব সূক্ষ্ম কৌশল বা ম্যানিপুলেশন-এর চেহারাটা বিশদ দেখিয়েছেন ভাষা ও সমাজবিজ্ঞানী নোম চম্স্কি আর এডওয়ার্ড এস হার্মান তাঁদের 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট ঃ দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অব মাস মিডিয়া' বইতে। (১২) তাঁর বক্তব্য, উন্নত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিপুঁজি - নির্ভর গণমাধ্যমগুলির প্রশাসনের নানা কৌশলের প্রভাবে রাষ্ট্রনীতির গুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির সমর্থক বা প্রবক্তার কাজ করে। আর তাতে প্রভাবিত হয় জনমত। কাপুসিন্স্কি যেমন বলেছেন, প্রথম বিশ্ব হয়তো এখনো মিশ খায় না গণতন্ত্র আর সেন্সরশিপ; কিন্তু তৃতীয় বিশ্ব সেন্সরশিপ কখনোই নয় একনায়কতন্ত্রের একচেটিয়া সম্পত্তি। বরং, শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন বা নৈতিকতার অজুহাতে সেখানে গণতন্ত্র আর সেন্সরশিপের সহাবস্থান। আর কখনো-কখনো, স্বাধীন ভারতের ফিল্ম সেন্সরশিপে ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেমন, ব্যবহারিক কৌশলে রাষ্ট্র আদায় করে নেয় নাগরিক সম্মতিও।

নির্দেশিকা

১। ভারতের জাতীয় মহাফেজখানায় হোম (পলিটিক্যাল)/ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭/৮২-১১০ (পার্ট এ) ফাইলে দেখেছি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের একটি নোট। এই নোটটি তৈরি হয়েছিল ভারতীয় চলচ্চিত্র আইন প্রণয়নের প্রস্তুতিপর্বে। ১৯১৭ সালের ভারতীয় চলচ্চিত্র আইনই বৃটিশ ভারতে ফিল্ম সেন্সরব্যবস্থার ভিত্তি। নোটের বক্তব্য;'কৌশলগত এবং অন্যান্য কারণে এই খসড়া আইনের রাজনৈতিক তাৎপর্যটিকে প্রকাশ্যে গুত্ব না-দেওয়াই উচিত হবে। বরং এই আইনের উদ্দেশ্য হিসেবে দর্শকের নিরাপত্তা-বিধান এবং অশালীন প্রদর্শনীর নিবারণ মত কারণগুলিকেই তুলে ধরা ভালো।'
২। এ কে গোপালন বনাম মাদ্রাজ সরকার, রমেশ থাপ্পার বনাম মাদ্রাজ সরকার এবং অমরনাথ বালি বনাম পাঞ্জাব সরকার।
৩। এখানে আমাদের মনে পড়তে পারে যে, স্বাধীন ভারতে সামাজিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল যে এখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনির্ভর সভ্য সমাজ বা সিভিল সোসাইটির বদলে তৈরি হয়েছে একধরনের সংঘনির্ভর রাজনৈতিক সমাজ। এখানে ব্যক্তিস্বরকে দ্ধ করে দিয়ে বা অন্তত চাপা দিয়ে, প্রাধান্য বিস্তার করে এক সংঘস্বর -- রাজনৈতিক দল, সংগঠন বা দলনিরপেক্ষ রাজনৈতিক সংগঠনের প্রভাবে।
৪। এপ্রসঙ্গে সতর্ক পাঠকের মনে পড়তেও পারে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ১৭৯১ সালে গৃহীত প্রথম সংশোধনীটিতে নাগরিকদের দেওয়া হয়েছিল মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা।
৫। ১৯৫৮ সালে ঠিক একইভাবে এদেশে পরমাণু বোমা তৈরির নীতিগত প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে সাজানো হয়েছে 'রণনীতিগত প্রতিরোধক'-এর (strategic deterrent) যুক্তি।
৬। এর এক যুগ পরে, ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে, সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বাক্-স্বাধীনতা বা অবাধ অভিব্যক্তির ওপর যুক্তিসঙ্গত প্রতিবন্ধক আরোপের অজুহাত হিসেবে ১৯(২) ধারায় অতিরিক্ত আরএকটি কারণ যোগ করা হয়েছিল - 'ভারতের অখন্ডতা আর সার্বভৌমত্বের স্বার্থে'।
৭। এই রায় দেওয়া হয়েছিল নরেন্দ্র কুমার বনাম কেন্দ্রীয় সরকার মামলায়।
৮। সত্যের খাতিরে অবশ্য বলে নেওয়া ভালো, পাকিস্তানের সিনেমাতেও ভারতের জন্য থাকে দেশপ্রেমমূলক বিষোদগার।
৯। দ্র. 'রিপোর্ট অব দ্য এনকোয়ারি কমিটি অন ফিল্ম সেন্সরশিপ' (১৯৬৯), পৃ. ৫৫।
১০। ১৯৫৬ সালের রায়ের পরে নীরবেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে ১৮৭৬ সালের নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনটি।
১১। এত যে প্রতিবাদী খাব্জা আহ্মেদ আববাস, উনিও সেমিনার নামের মাসিক পত্রিকায় ১৯৬৩ সালের জুলাই সংখ্যায় সিনেমায় সেন্সর ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর কথায় ঃ "একথা যদি আমরা মেনেও নিই যে একজন ঔপন্যাসিক, বা চিত্রকর বা সঙ্গীতশিল্পীর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপছাড়াই স্বাধীনভাবে লিখতে, আঁকতে বা গাইতে পারবার অধিকার আছে, তাহলেও আমার মনে হয় না যে সিনেমার মতো প্রকাশ এবং প্রমোদের এত শক্তিশালী একটি মাধ্যমকেও ঠিক একইরকম স্বাধীনতা দেওয়ার সুপারিশ কেউ করবেন। বাণিজ্যিক সিনেমা যদি জনচির নিম্নতম উপ

াদানগুলিকে অবলম্বন করে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে ওঠে , তাহলে তার ফল যে কী হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিশেষত আমাদের এই দেশে, যেখানে দুশো বছরের রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক অবদমনের জেরে সংস্কৃতিক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি আর অবক্ষয়।

অবাধ মতপ্রকাশের আর অভিব্যক্তির স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে সিনেমাক্ষেত্রের ধনকুবেররা টাকা কামাবার জন্যে বিকৃতচি আর অশ্লীলতাকে মূলধন করবেন, সেসবের জয়গান করবেন।''

১২। নোম চম্স্কি এবং এডওয়ার্ড এস হারম্যান, ম্যানুফেকচারিং কনসেন্ট ঃ দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অব মাস মিডিয়া লন্ডন ঃ ভিন্টাজ, ১৯৯৪।

।। এটি বারোমাস পত্রিকার শারদীয় ১৪০৯ বঙ্গাব্দ (২০০২ খৃষ্টাব্দে) সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংশোধিত রূপ।।